ধীরে বি. বি. বাবুরা ধীরে

ইমানুল হক

খাটুনি যত বাড়ছে ততই
পুঁজির পোয়া বারো
মজুরিকে ছাড়িয়ে লোভের
বহর বাড়ে আরো।

ভুতের বেগার।। সুভাষ মুখোপাধ্যায়

।।এক।।

আজকাল, মার্কসবাদকে ভাঙিয়ে ক্ষমতার Marks তোলা রাজনীতি ব্যবসায়ী বলতে শুরু করেছেন, ‘বহু আগে লেখা মার্কসবাদী তত্ত্ব দিয়ে বর্তমান সময়, সংকট ও পুঁজির অবস্থানকে বোঝা যাবে না। কেন না, তখন তো এত প্রযুক্তিগত অগ্রগমন ঘটেনি। যুক্তি বটে। তবে এই যুক্তি নতুন কিছু নয়। প্রায় ১০০ বছর ধরেই এসব কথা শোনা যাছে। প্রুঁধো থেকে আরম্ভ করে কাউৎস্কি বার্নস্তাইন পন্থীরা নানাভাবে নানা রঙে এসব কথা বলেছেন। বলেছেন ইউরো-কমিউনিস্টরা। বলেছেন স্তালিনকে নস্যাৎ করার চেষ্টায় প্রাণপণে খাটতে থাকা ক্রুশ্চভ - বুলগানিনরা।

তাঁদের বঙ্গীয় সংস্করণদের সমস্যা একটু জটিল। এরা পড়েছেন এত কম, এবং বলেন এত বেশি যে, ফাঁকটা সহজেই ধরা পড়ে যায়। খুব বেশি তাত্ত্বিক আলোচনায় তাদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হবার দরকার হয় না। তবে, এরা কেউ কেউ তথ্যের কারবারি। তাই তথ্য দিয়েই এদের আপ্তবাক্যগুলির মোকাবিলা করা যেতে পারে।

।।দুই।।

মার্কসের গ্রন্থটির নাম পুঁজি। যার জার্মান নাম ডাস ক্যাপিটাল, বাংরেজরা যাকে ‘ক্যাপিটাল’ বলতেই ভালবাসেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা একসময় ম্যানেজমেন্ট পড়তে যেতেন, তাঁদের বাধ্যতামূলক ভাবে ‘পুঁজি’ বা ক্যাপিটাল বইটি পড়তে হত। ষাটের দশকে রাজনীতি শেখা মার্কসবাদীদের জন্যও কি সেটি বাধ্যতামূলক ছিল? দেখে শুনে মনে হয়, অনেকেই সেটি পড়েননি। অথবা নিজেদের প্রচার ও ‘পুঁজি’ বাড়ানোর লক্ষ্যে তাঁরা এতখানি নিয়োজিত যে, ‘পুঁজি বইয়ের শিক্ষা আদ্যন্ত ভুলে মেরে দিয়েছেন।

।। তিন।।

পুঁজিবাদীদের স্বর্গরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যানেজমেন্ট গুরুদেব মন্ত্রঃ আগামী দশকে পৃথিবীর একনম্বর ব্যবসা হবে শিক্ষা। অতএব শিক্ষা ব্যবসায় ঝাঁপাও। বিশ শতকের নয়ের দশকের শুরু উপসাগরীয় যুদ্ধ তথা ইরাক আক্রমণের সুবাদে অস্ত্র বাণিজ্যে খানিকটা চাঙ্গা ভাব আসার পরই, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন অবস্থায় অস্ত্র ব্যবসায় ভাঁটা পড়ে। পৃথিবীর বাণিজ্যে এক নম্বর থাকা অবস্থানও টলে যায়। পৃথিবীর প্রথম পাঁচটা ব্যাঙ্কের মধ্যে একটিও মার্কিন ব্যাঙ্ক ছিল না। প্রায় সবগুলোই জার্মান ব্যাঙ্ক। জার্মান মুদ্রা জয়েশর্মার্খের বাজারদর ডলারের বুকে কম্পন ধরিয়ে দেয়। চীন তখনও এই চীন হয়নি। জাপানের মার্কিন বাজারে ঝাঁপানো দেখে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি কতটা মানা উচিত সে নিয়ে ভাবিত মার্কিন কর্তারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্মাণ শিল্পের ৬০ শতাংশ তখন জাপানি দখলে। মার্কিনীরা রাজকাপুরের ছবির গানের মতো যে ‘মেরা জুতা হ্যায় জাপানি, ফিরভি দিল হ্যায় মার্কিনি’ - সমস্বরে গাইতে শুরু না করে তার জন্য সিনিয়র বুশ জাপান যাত্রা করেন। গিয়ে জাপান যাতে কম জুতো রপ্তানি করে, সেই অনুরোধ করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভোজসভায় ভির্মি খান। সে ছবি কারও অন্তত মনে থাকার কথা। ১৯৯৪ - এ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মডেলকে মুকুট পরানোর পর চাঙ্গা হয় মার্কিন বিলাস দ্রব্যের বাজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতিতে আবার এক নম্বর হয়ে ওঠে। তখন ভালভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও তথাকথিত বহুজাতিক মহলে চাউর হয়ে গেল এই কথাটা - বিশ কোটির বাজার ভারত। গোটা ইউরোপের বাজারের থেকেও বড়। উদারীকরণের ঢেউ এসে পৌঁছাল ভারতেও। এরই মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের স্নেহধন্য মনমোহন সিং ভারতের অর্থমন্ত্রী। ডলারের কাছে টাকার হার মানার সেই শুরু। বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানো হল। ১৮ টাকার ডলার ৩৩ টাকায় পৌঁছাল। বলা হল, প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় শিল্পজগৎ বিশ্ববাণিজ্যের সমকক্ষ হবে। দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। (কত চাঙ্গা সে তো দেখাই যাচ্ছে। তিনগুণ দামে কিনতে হয় এক ডলার)

।।চার।।

এক দশক পার। কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী জাকার্তায় কমিউনিস্ট নিধনকারী সুহার্তো দোসর সালিমদের আনুষ্ঠানিক সেলাম ঠুকতে যাওয়ার আগে জানিয়ে গিয়েছিলেন ঃ স্কাই ইজ দ্য লিমিট। একই কথা তো আমরা আগেও শুনেছি। উদার প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওয়ের মুখে। নরসিমা রাওকে নরসিংহ বানিয়েছিল আনন্দবাজার। নরসিংহ রাওকে কলকাতায় ডেকে আনন্দবাজার ঘোষণা করেছিল ঃ আমরা পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়নের পক্ষে । সেদিন কতই না স্তুতি তাঁর। আজও স্তুতি এবং প্রশংসার ফুলঝুরি - আধার খালি গেছে বদলে ঃ নরসিংহের বদলে বুদ্ধদেব। কংগ্রেসির বদলে মার্কসবাদী। তাদের কাছে সবই পণ্য। তাই বিজ্ঞাপনে লেখে, লিখতে সাহস করে ঃ ঐশ্বর্য থেকে বুদ্ধদেব।

পণ্যকে বেচতে হয়। পণ্য বিক্রেতার স্বার্থেই তাই দরকার হয় চটকদার বিজ্ঞাপন। কারও শরীর নিয়ে কারও সরকার নিয়ে।

।।পাঁচ।।

যে কথা বলতে বলতে এতদূর চলে আসা - সেই মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা

-- এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। লেনিন লিখেছিলেন ঃ সোস্যাল ডেমোক্রাটরা প্রথমে পুঁজিবাদের সংস্কার করতে চায়, পরে পুঁজিবাদের দালালে রূপান্তরিত হয়। সোস্যাল ডেমোক্রাটদের এটাই অনিবার্য পরিণতি। পুঁজির সংস্কার করা যায় না, পুঁজির ধর্মই শ্রমিকশ্রেণীর ও তাঁর মতাদর্শকে সংহার করা।

সেই সংহার করার জন্য তারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই দালাল খোঁজে। দালালদের এরা তিন ভাবে কেনে। আর্থিক সুবিধা দিয়ে কেনাটা সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলেও সব সময় এরা সে পথে হাঁটে না। এপথটি তো আছেই। সঙ্গে পুরনো পন্থা - প্রচার ও প্রশংসা। এবং পারলে পুরস্কার।

মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে তাত্ত্বিক লড়াইয়ে নেমে প্রুঁধো বুর্জোয়াদের প্রচার লাভ করেছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস তো একটা সময় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিস্কৃত পর্যন্ত হয়েছিলেন। প্রচার, প্রশংসা, এবং পুরস্কার যে কীভাবে একজনের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে, তার অন্যতম নিদর্শন গরবাচ্যভ। নোবেল শান্তি পুরস্কারের মনোনয়ন তো আছেই তার সঙ্গেই প্রতিনিয়তই সংসাদমাধ্যমে ছবি। আজ সিনিয়র বুশের সঙ্গে, কাল আরেকজনের সঙ্গে। আজ সংবাদমাধ্যমে সবচেয়ে দামি দূরবীণ দিয়ে খুঁজলেও তাঁর ছবি বা নাম পাওয়া যাবে না।

তাঁর রাষ্ট্রকর্তৃত্ব নেই, সেই প্রচারও নেই। অবশ্য পয়সা প্রচুর হয়েছে। সৎ, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির গরাচ্যভ বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়ে পয়সা কামাচ্ছেন। এই গরবাচ্যভেরও মনে হয়েছিল ঃ মার্কসবাদের পুনর্গঠন করা দরকার। তার জন্য পার্টি নেতারাও কম দায়ী ছিলেন না। তাঁরা কেউ প্রতিবাদ সেভাবে করেননি। নিজেদের পদ আকঁড়ে ধরে রাখতে খয়ের খাঁ-র ভূমিকা নিয়েছেন। একা গরবাচ্যভ সব কিছু করে দিয়েছেন ভাবলে ঐতিহাসিক ভুল হবে। তা থেকে শিক্ষাও নেওয়া যাবে না। যায় যে নি, তা তো

চারপাশ দেখেই মালুম হচ্ছে। গারবাচ্যভের বিরুদ্ধে যদি পার্টি নেতৃত্ব রুখে দাঁড়াতেন, তাঁকে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ভাবে সেন্সর ও সতর্ক করতেন, তা হলে তো এই হাল হত না। তা না করে, তাঁরা আরামের মায়া ত্যাগের ভয়ে, পদ হারানোর ভয়ে, প্রচার মাধ্যমের ভ্রুকুটির ভয়ে ঘাড় নেড়েছেন। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা-র পক্ষে যুক্তি খুঁজেছেন, সাজিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই মতের বিরুদ্ধে নিন্দা ও চক্রান্ত করতেও ছাড়েননি। যাঁদের কোণঠাসা করা হয়েছিল সেদিন, তাঁরাই আজ রাশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনের সারিতে। গরবাচ্যভের মত ও পথে যে সব পার্টি নেতা রাবার স্ট্যাম্প মারতে বা তাঁকে আগে বাড়িয়ে সমর্থন করতে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা কোথায়? এজন্যও দূরবীন লাগবে? মার্কস - এঙ্গেলস ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন ‘কমিউনিস্ট ইস্তেহার’। সংশোধনবাদীরা যখন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তখন বইটির লাল রঙের মলাট পাল্টিয়ে নীল, হলুদ, সবুজ নানা রঙের করা হয়। আর আজ পুঁজিবাদীরা ও তাঁদের বিশ্বস্ত প্রচারকরা বুঝে গেছে লাল রঙকে আর ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই। কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাসের রঙ লাল করায় ৮০- দশকে আনন্দবাজার ও সুব্রত মুখার্জিদের সেকি শোরগোল! আর আজ আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনের প্রধান রঙ লাল। ত্রিপুরার কবি ব্রজলালরা যদি এসব জানতেন! তবে কমিউনিস্ট ইস্তেহারের মলাট সবুজ হওয়াটা বোধহয় প্রতীকী। কতগুলি চিরসবুজ, চির নবীন হয়ে গেছে। পুরনো হয়নি। কমিউনিস্ট ইস্তেহারে লেখা হয়েছিল ঃ সমস্ত সম্মানজনক বৃত্তিকে পুঁজিবাদ দাসবৃত্তিতে পরিণত করে।

আজও তা ভীষণরকমভাবে সত্য।, নতুন এক দাসযুগে পৌঁছেছি। ১২ ঘন্টা কাজ। ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম, ৮ ঘন্টা ঘুম - সে তো স্বপ্ন এখন। আনন্দবাজার ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে একটি লেখা ছেপেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মীদের সাংসারিক জীবন ব্যাহত। বিচ্ছেদ বাড়ছে। যৌন আগ্রহ ক্ষীয়মান। এমনকী স্পার্ম কাউন্টও পর্যন্ত কমে যাচ্ছে।

।। ছয় ।।

‘পুঁজি’ গ্রন্থটা যাতে না পড়তে হয়, তার জন্য কতগুলি কথা ছাত্রজীবনে শুনেছি। ক. বেশ কঠিন। খ. ইংরেজি না পড়লে বোঝা যায় না। গ. রাশিয়ান অনুবাদের বাংলাটা তেমন ভাল নয়।

ইদানিং সংস্কারবাদীরা মার্কসবাদেরও সংস্কার কার্যে নেমে পড়েছেন দেখে ভালভাবে পড়তে হয় ‘পুঁজি’ বইটা। জার্মান ভাষা তো জানি না, ইংরেজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদটাই ভাল বুঝবো জেনে পড়া। পাঠক বলতে পারি, কোথাও কোথাও একটু সময় নিয়ে পড়তে হলেও মাঝে মাঝে মার্কসের ‘পুঁজি’ গ্রন্থটি উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর বলে বোধ হয়েছে। পাঠক, পড়ুন। সাহস করে। চিন্তার ধান্দাকে প্রতিহত করতে সঠিক পড়াশোনা খুব জরুরি।

।। সাত ।।

আজকের দিনে শিক্ষা - ব্যবসা - পৃথিবীর দু’নম্বর ব্যবসা। এবং এই ব্যবসায় শিক্ষক আজ আর শুধু শিক্ষক নয় - শ্রমিক। ‘পুঁজি’ গ্রন্থে মার্কস লিখছেনঃ

‘শ্রমিক উৎপাদন করে তার নিজের জন্য নয়, পুঁজির জন্য। সুতরাং সে কেবল উৎপন্ন করছে এটাই আর যথেষ্ট নয়। তাকে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করতে হবে। কেবল সেই শ্রমিকই উৎপাদনশীল যে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করে, এবং এভাবে পুঁজির আত্মবিস্তারের জন্য কাজ করে।

(পুঁজি ।। খণ্ড ১ অংশ ২।। পৃ. ১২)

এটা বলে যে উদাহরণ দিচ্ছেন মার্কস, তাতেই আসছে শিক্ষকের শ্রমিক বনে যাওয়ার কথা।

মার্কসের মন্তব্য ঃ ‘বৈষয়িক বস্তুসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রের বাইরে থেকে একটি উদাহরণ যদি আমরা নিই, একজন স্কুল শিক্ষক তখনই উৎপাদনশীল শ্রমিক যখন তিনি তাঁর ছাত্রদের মাথায় বিদ্যা ঢোকানো ছাড়াও স্কুলের মালিকের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ঘোড়ার মতো খাটেন।’ আজ তো বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকরা তো কার্যত শ্রমিক। মালিকের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যই তাদের খাটতে হয়।

এখানেও মনে পড়বে লেনিনের কথা ঃ শ্রমিকশ্রেণীকে লড়তে হয় দুধরনের শত্রুদের বিরুদ্ধে। ভিতরের ও বাইরের। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে থাকা দালালরা পথ ভ্রান্ত করতে চায়, গড়ে তোলে উপদল। ভিতরের শত্রুদের ভিতরে রেখে দিয়ে বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়ার অর্থ ভিতর ও বাইরে দু’দিক থেকে শত্রুর ব্যূহের মধ্যে আটকা পড়া।

।। আট ।।

মার্কসবাদের সংস্কারদের উদ্দেশে শোনানো যেতে পারে ‘পুঁজি’ থেকে উদ্বৃত্ত আরেকটি মন্তব্যও-

যে সব স্বাধীন উৎপাদক তাদের হস্তশিল্প বা কৃষিকাজ চিরাচরিত সাবেকি প্রথায় চালিয়ে যায় তাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে সুদখোর মহাজন বা ব্যবসায়ী, তাঁর মহাজনী পুঁজি বা ব্যবসায়ী পুঁজি নিয়ে, পরগাছার মতো তাদের শুষে যাচ্ছে।

(পুঁজি ।। ১ম খণ্ড, অংশ ২ ।। পৃঃ ১৩)

কথাটি কি আজও সমান প্রাসঙ্গিক নয়? এই পশ্চিমবাংলায় যেভাবে চাষি ও তাঁতিরা নয়া সুদখোর ও মহাজনদের শিকার হচ্ছে - তাতে তো কথাটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

।। নয় ।।

আজকের দিনে একটা অভিযোগ উঠছে, সৃষ্টিশীল, চিরকালীন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না। কেন? সে নিয়ে অনেক কথা। মার্কস ‘পুঁজি’ গ্রন্থে এর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, ‘‘প্রকৃতি যেখানে বড় বেশি উদার, সেখানে সে তাকে মুঠোর মধ্যে রাখে, আঁচল - ধরা শিশুর মতো। নিজেকে বিকশিত করার কোনো প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতি তার উপরে চাপিয়ে দেয় না।’’ এই মন্তব্যের সমর্থনে মার্কস উদ্ধৃত করছেন টমাস মানের লেখা। ‘ইংল্যান্ডস ট্রেজার বাই ফরেন ট্রেড’ গ্রন্থে টমাস মান লিখেছেন ঃ প্রথমটি (প্রাকৃতিক সম্পদ) যেমন সবচেয়ে মহৎ ও সুবিধাপ্রদ, তেমন মানুষকে তা অসতর্ক, গঠিত ও অমিতাচারী করে তোলে, পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি বলবৎ করে সতর্কতা, সাহিত্য, কলা ও রাজনীতি।

আজ যে ভাল সাহিত্য, সংস্কৃতির বড় অভাব তার কারণ, সুখী, সংগ্রামহীন মনোভাব। সঠিক রাজনীতির তো দেখা মিলছে না- এই একই কারণে।। এত স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ও আরামের কল্পনা সৃষ্টিশীল, মহৎ কিছুর জন্ম দিতে পারে না।

।। দশ ।।

আজকের দিনে ব্যাপক শোরগোল উঠেছে - শিল্পায়ন নিয়ে বহু ধাপ এগিয়ে গিয়ে কেউ কেউ শুনিয়ে ফেলেছেন - শিল্পায়ন মানেই শ্রেণীসংগ্রাম। এতো দেখছি নয়া লেনিন। লেনিন শ্লোগান দিয়েছিলেন - বিদ্যুতের অপর নাম সমাজতন্ত্র। সে কারণে কৃষ্ণসাগরের জমাট বাঁধা বরফ গলিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। এন. পোগোদিনের ক্রেমলিন টাইমস বা ‘ক্রেমলিনের ঘড়ি’ নাটকে তার সাক্ষ্য মেলে। এই বিদ্যুৎ দিয়ে চাষি তার জমিতে উৎপাদন বাড়িয়ে ছিল। চাষির স্বচ্ছলতা আসায় শিল্প বিকাশের পথ ত্বরান্বিত হয়েছিল। শিল্প গড়লেই তো আর শিল্প চলবে না। তার বাজার থাকতে হবে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে তবে মানুষ বেশি বেশি করে ভোগপণ্য ব্যবহার করবে। ফলে শিল্পের বাজার বাড়বে। সাধে তো আর হণ্ডা কোম্পানি উৎপাদন কমায়নি। তাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতার এক চতুর্থাংশ তারা অনেক সময়ই ব্যবহার করেছে। ফলে শ্রমিক ছাঁটাই। চাষির অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটজনক। দেশে। এরাজ্যেও। বর্তমানে রাজশেখর রেড্ডির অন্ধ্র সরকার যেখানে চাষির জন্য বিদ্যুৎ প্রায় বিনামূল্যে দিচ্ছে, মহারাষ্ট্র সরকার মাসে মাত্র ৫০ টাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে, সেখানে এ রাজ্যে বিদ্যুতের দাম প্রবলভাবে বাড়ার মুখে। চাষি মরলে শিল্প বাঁচবে কি করে? বলবেন, এতো পুরনো কথা, পুরনো, তবে চির নতুন। কোন শিল্পগোষ্ঠী যখন কোনও শিল্পস্থাপন করতে আগ্রহী হয়, তখন তার সমীক্ষা করে দেখে

সেখানে কোন ধরনের বাজার আছে। পশ্চিমবঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার একটি সংস্থা মোটরবাইক কারখানা করবে বলে বাজারে প্রচার চলছে। কেন তারা এখানে মোটর বাইক কারখানা করতে চাইছে? কারণ, এখানে কৃষ্রি বিকাশ ঘটেছিল। চাষির হাতে পয়সা এসেছিল। পরিসংখ্যান দিই।

	গ্রামের বাজার
বাইসাইকেল	৭০% এর উর্দ্ধে
রেডিও	৭০% এর উর্দ্ধে
জুতো ও দাঁতের মাজন	৬০ - ৭০%
মোটরবাইক ও স্কুটার	৫০ - ৬০%
সাদা - কালো টিভি	৪০ - ৫০%
ভ্যানিশিং ক্রিম	২০ - ৩০ %
ফ্রিজ	১০ - ২০%
রঙিন টিভি	১০ - ২০%

(সুত্র ঃ এস এল রাও -কনজি উমার মার্কেটস ডেমোগ্রাফিকস ইন ইন্ডিয়া)

এই যে মোটর বাইকের গ্রামীণ বাজার তার দিকে তাকিয়ে উলুবেড়িয়া লগ্নি আওয়াজ। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা, তেল নির্ভর মোটর বাইক উৎপাদন কারখানা কি বেশিদিন বাঁচবে? কারণ, গ্যাস - নির্ভর্ক বাইক বাজারে চলতে শুরু করেছে। আর ২০২০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ চালিত বাইক বাজারে এসে যাবে। তখন?

।। এগার ।।

একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে তার ভাষা চিন্তা ও বিজ্ঞান চিন্তার উপর। বিজান গবেষণা ছাড়া কোন উন্নতি সম্ভব নয়। প্রযুক্তি সে তথ্য বা কাপড়, কি কয়লা যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তা গবেষণা ছাড়া উন্নত হতে পারে না। আর এ কাজটার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা। তার জন্য বিজ্ঞানের সূত্রাবলী ভাল ভাবে বোঝা দরকার। সে কাজটা মাতৃভাষাতেই সবচেয়ে ভালভাবে সম্ভব। আথচ এরাজ্যে মাতৃভাষা সবচেয়ে বেশি। অবহেলিত। আর বিজ্ঞান গবেষণার জন্য রাজ্য সরকারের কোণ মাথা - ব্যথা নেই। রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দেখবার জন্য আলাদা মন্ত্রী পর্যন্ত নেই।

অথচ মন্ত্রিসভার একজন সদস্য বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রির শুধু অধিকারী নয়, খড়গপুর আই আই টি থেকে পি এইচ ডি পর্যন্ত করেছেন।

মোবাইল ব্যবহার প্রচুর হয়, অথচ রাজ্যে কোনও মোবাইল তৈরির কারখানা গড়ে উঠল না। রাজ্য সরকার কি কোনও অর্থ বরাদ্দ করেছেন এর গবেষণার জন্য? কমপিউটার হার্ডওয়ার তৈরির কারখানা শান্তনু ও তথাগত নামে দুজন তরুণ গড়ার কথা ভাবতে পারে। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার ভাবতে পারে না। ভাবতে চায় না। তাদের ঝোঁক সস্তা চটকে। প্রচারে আরও একটি কারণও বিদ্যমান। এইসব উৎপাদক বহুজাতিকদের চটাতে চায় না। তাদের চাঁদা, শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি, নানাভাবে নিতে হয় যে।

কাজ না করলে....

কথা উঠতে পারে, ওয়েবেল তো গড়েছিল রাজ্য? তার অবস্থা কি? প্রশ্ন একটাই - ওয়েবেল - এর এমন দশা হল কেন? শ্রমিকের দোষে কারখানা অচল হয় না তা নয়, তবে মূলত পরিচালনার ত্রুটিতেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একটি চীনা ছোট গল্পের কথা মনে পড়ছে। সেখানে দেখানো হয়েছিল, কমিউনিস্ট সরকার পরিচালিত একটি কারখানার একদল পরিচালক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা একই ধরনের একটি বেসরকারি কারখানাকে ঘুষের বিনিময়ে মদত দিয়ে সরকারি কারখানার মাল পাচার করে কীভাবে কারখানাটিকে রুগ্ন করে তুলেছিল। এই ঘটনা তো এখানেও ঘটে। সরকারি সংস্থার কাউকে দেখা যাচ্ছে অবসরের পর বে - সরকারি কারখানায় উচ্চ - পদ নিতে। তার মানে, সরকারি পদে থাকার পর বে-সরকারি কারখানাকে উৎসাহিত, উদ্দীপিত এবং উদ্যোগময় করে তোলার জন্য সরকারি সংস্থাকে রুগ্ন ও অচল করার মূল্য হিসাবে ঘুষ, পারিতোষিক বা পুরস্কার গ্রহণ। ওয়েবেল - এর সিটু নেতৃত্ব যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাকে তো অগ্রাহ্য দেওয়ার জন্য অথচ ১০০ কোটি টাকা খরচ করা গেল না ওয়েবেল -এর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য?

এই একই কাজ অরুণ শৌরিরাও করেছিলেন। বিজেপি-র মন্ত্রী অরুণ শৌরি বেসরকারিকরণের উদ্যোক্তা হয়ে দাঁড়ানোর সমালোচনা করা হয়েছিল - একই কাজ ‘কমিউনিস্ট’ মন্ত্রী করেন কি করে? শুধু সেই ফাটা রেকর্ড বাজাবেন, শ্রমিকরা কাজ না করলে...? আসল কথা কাজ না করালে? মেট্রো রেল এত পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন অন্য রেল নয় কেন? পরিচালনার গুণে।

।। বারো ।।

আরেকটি দিকও আমাদের ভাবা দরকার, কোন ধরনের শিল্প গড়লে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী লাভ হবে। অন্য জায়গায় বা দেশে যা পরিত্যক্ত সেই ধরণ ও প্রযুক্তি নিয়ে চললে লাভ নেই। আমাদের শিল্প গড়তে হবে, আমাদের শিকড়ের দিকে তাকিয়ে। তথ্য - প্রযুক্তি শিল্পে জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে কেউ নয়। কিন্তু শুধু তথ্য - প্রযুক্তি দিয়ে কি একটা দেশ, রাজ্য বা জাতি বাঁচতে পারে। সিপিআই (এম)- এর তাত্বিক মুখপত্রে হীরালালনাথ লিখেছেন, গোটাপৃথিবীতে ১২৫০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকা। এটা তো আমাদের মোট রাজ্য বাজেটেরও কম টাকার। গোটা পৃথিবীর সমস্ত ব্যবসাটাই তো বাংলায় হবে না। হলেও তো রাজ্য চালানো যাবে না। এর থেকে অনেক বেশি কালো টাকা এরাজ্যের বাজারে আছে। তাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা দরকার। রাজ্যে বাজার বা কর সংগ্রহ যথাযথ হয় না। সেখানে যথেষ্ট দুর্নীতি। মাত্র ১৬৩৪ কোটি টাকার রাজস্ব হয় এরাজ্যে। এর অন্তত তিনগুণ বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। আবার এ রাজস্বের ৫৬ শতাংশ চলে যাচ্ছে উড়ালপুল ইত্যাদি বাবদ নেওয়া ঋণের সুদ মেটাতে। কোনও উৎপাদক সংস্থা বা কারখানা গড়া যাচ্ছে না।

সরকারের টাকা নেই তা নয়, টাকা খরচ হচ্ছে ভুল-ভাল কারণে, বিলাসিতায়।

কয়েকটি প্রশ্ন ঃ

ক) তেলখাতে তথা গাড়ির কারণে কত টাকা ব্যয় হচ্ছে রাজ্যে?

খ) অতিথি আপ্যায়নে কত খরচ?

গ) ঢাক-ঢোল পেটানো বিজ্ঞাপনে কত খরচ?

ঘ) প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের কতটা ঠিকাদার বা ঘুষ ইত্যাদি বাবদ অপচয় হচ্ছে কতটা কাজে লাগছে তার কোন সমীক্ষা করা হয়েছে কিনা? না হলে কেন হয়নি?

ঙ) জনসাধারণ নিয়ে কমিটি গড়ে কাজ করানোর সরকারি ঘোষণার কি হল?

ধান ভানে, গীতও শোনে ঃ

এই প্রশ্নগুলি ধান ভানতে শিবের গীত নয়। আসল কথা অনুৎপাদক খাতে শুধু নয়, অপচয়ে নষ্ট হচ্ছে সরকারি টাকা। এই টাকায় সহজেই শিল্প গড়া যেতো। আর একটা

পথ আছে ভেনেজুয়েলার পথ। সমবায় গঠনের পথ। কিন্তু এরাজ্যে সমবয় আন্দোলনের দশা তো দেখা যাচ্ছে। ব্যতিক্রম আছে, শ্রীধরপুরের মতো সমবায়। কিন্তু সেখানে সব দল মিলে কাজ হয়। একদলীয় কর্তৃত্ব সেখানে এখনও সেভাবে নেই - তাই চলছে। কিউবায় এইভাবেই কাজ হয়। কমিউনিস্ট পার্টি থাকলেও গ্রামের বৈঠকে ঠিক হয়, কারা পার্টি সদস্যপদ পেতে পারে বা কীভাবে টাকা খরচ হবে। কয়েকজন ব্যক্তি বা কোনও গ্রুপ সেখানে নিয়ামক নয়।

আবার কেরল মডেলও নেওয়া যেতে পারে। সেখানে উইপ্রো বা ইনফোসিসেস আশায় বসে নেই পার্টি নিজেরাই যেমন টিভি কেন্দ্র গড়েছে। তেমনই নিজেদের টাঙ্কায় গড়ে তুলেছে তথ্যপ্রযুক্তি। এতে পার্টির ছেলেরা কাজ পাচ্ছে। রাজ্যের উন্নতি হচ্ছে। বিজ্ঞান - প্রযুক্তিতে মাথাগুলি খাটছে। শুধু নিছক গোষ্ঠীবাজিতে নষ্ট হচ্ছে না বুদ্ধির চর্চা।

কত পাই দিয়ে কত ক্রোড় পেলি বলঃ

১৬ সেপ্টেম্বর প্রতিদিন দেখুন। সেখানে দেখা যাচ্ছে লন্ডনে বেকার বেড়ে গেছে। গোটা গ্রেট - ব্রিটেনেই। ২০ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে। বেকার ১২ শতাংশ। সেখানে কাজ না করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ডি এফ আই ডি এখানে নাকি দান খয়রাত করতে এসেছে। ৫৩ কোটি টাকা তারা অনুদান দিয়েছে? মোট ২০০ কোটি টাকা। আর বাকি তো সব ৯ শতাংশ সুদে ঋণ। রাজ্যে সিপিআই(এম)-এর গণসংগঠনগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ২ কোটি ২০ লাখ মাসে গড় ১০ টাকা করে চাঁদা তুললে বছরে ২৪০ কোটি টাকা চাঁদা ওঠে। এমন তো নয়, যে পার্টি চাঁদা তোলে না। এই টাকাটা তুলে পার্টি পরিচালিত কারখানা গড়ে কি ক্ষতি হতো? যে কাজ জানে তাকে নিতে হবে - শুধু তোষামুদে বা ‘ইয়েস ম্যান’ নিয়ে কাজ চলে না। ‘ইয়েস ম্যান’রা কোনও বিশেষ ব্যক্তি হয়ে থাকে না। ক্ষমতা চলে গেলেই তারা নতুনভাবে ঝুলে পড়ে। ‘ইয়েসম্যান’ দের নীতি একটাই। নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া বা কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

শিল্পায়ন নয় নগরায়ণ ঃ

শিল্পায়নে কারও আপত্তি নেই। আপত্তি নগরায়ণকে শিল্পায়নে বলে চালানোর। হলদিয়া - পেট্রোকেমের বিরুদ্ধে আন্দোলন তো হয়নি। এই সেদিন হুগলির পোলবায় ১৭০০ লোকের চাকরির ব্যবস্থা হল জেনেটিকসের কম্পিউটার যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানায়। একটা পোস্টারও তো পড়েনি এর বিরুদ্ধে। এখানেও তো বিদেশি পুঁজি খাটছে। আপত্তি তো কোনও স্তরে ওঠেনি, সিমেন্ট কারখানা হয়েছে রাজ্যে - কোনও পোস্টার পর্যন্ত পড়েনি। আসলে আপত্তি মিথ্যা কথা বলে চাষির জমি কেড়ে নেওয়ায়। হুগলির ডানকুনিতে ২৫০০ একর জমি অধিগ্রহণের নোটিশ পড়ে। এক বছর আগে। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট ঘাত সালিমদের জন্যই সে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ। সেখানে জমি কেনা - বেচা আজও বন্ধ। কলকাতা থেকে দূরে এদিক - ওদিক উপনগরী গড়লে লোকে সেভাবে কিনবে না জেনেই তো কোনও কাজ হয়নি সেখানে। একটা ইঁট পর্যন্ত পড়েনি সেখানে। যদিও ২০ কোটি টাকা তারা রাজ্যকে দিয়েছে।

আসলে বিনিয়োগের লক্ষ্য মুনাফা - আরও মুনাফা। বাড়ি, রাস্তা বিমানবন্দর গড়লে হয়ত মুনাফা, কারখানা গড়লে তত নয়। কারণ কারখানায় মুনাফা একদিনে হয় না। তা দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আবাসন, রাস্তা, বিমানবন্দর গড়ে সহজেই বেচে দেওয়া যায়। একটা উপনগরীতে কতলোক কাজ পাবে? চাষের জমি যত লোকের কর্মসংস্থান করতে পারে, উপনগরীর ফ্ল্যাট তা পারে না। আর জমির মালিক অন্যের ফ্ল্যাটের দারোয়ান হবে, তার বাড়ির মেয়ে অন্যের ঝি বা সেবাদাসী? এ কোন ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম? বড়লোকের জন্য সস্তায় মজুর জোগানো শ্রেণীসংগ্রাম হলে তো মার্কসবাদটা আর মার্কসবাদ থাকে না, সেখানে মার্কস-কে বাদ দিয়ে Marks বাদের নীতি কাজ করে।

তথ্য, ভুল তথ্য ঃ

একটা কথা আছে - মিথ্যা তিন রকমের। তথ্য, তথ্য এবং চরম মিথ্যা। কিন্তু মুশকিল এই তথ্যকে বাদ দিয়ে তো চলা যেতে পারে না। যে যাই বলুন, এরাজ্যে সেচের প্রসার সেভাবে ঘটেনি। শুধু বর্ধমান বা হুগলী দেখে রাজ্যকে বিচার করা যাবে না। রেললাইন বা রাস্তার ধারের গ্রাম মানে সাধারণভাবে অন্যদের তুলনায় উন্নত গ্রাম। সেখানে কিছু চাষী ঋণ করে সাবমার্শিবল বসিয়েছেন বলে গোটা রাজ্যেই সে অবস্থা, ভাবা ভুল। ১৯৭৭ -এ রাজ্যে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ১৯.৬ শতাংশ। এখন ধান চাষে ২৫.ক্ষ শতাংশ। সব শস্য মিলিয়ে ২৭ শতাংশ। ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকের প্রতিবেদন পড়ুন। হাতের কাছে না পেলে অর্থনীতির ছাত্ররা যে দত্ত - সুন্দরম এর ‘ইন্ডিয়ান ইকনমি’ বই পড়েন - সেটি অন্তত দেখুন। আর রাজ্যে কৃষি জমির পরিমাণ মোটেও ৯৩ শতাংশ নয়। আসলে ৬৩ শতাংশ। না, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া প্রতিবেদন নয়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার প্রকাশিত ‘ওয়েস্টবেঙ্গল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৪’ - এর ১৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন। সেখানে পরিস্কার লেখা ঃ রাজ্যে মোট জমি, ৮,৮৭৫ হাজার হেকটর। এর ৬৩ শতংাশ কৃষিজমি, ১৪ শতাংশ অন্য কাজে লাগে। ওই বইয়ের ১৭৬ পৃষ্ঠায় একটি ম্যাপ এঁকে পরিষ্কার ভাবে সবকিছু বোঝানো আছে।

কোনও দলের জন্যঃ

ইরাক আগ্রাসনের আগে যুদ্ধপাগল মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সাহেব বলেছিলেন, যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে। বুশ সাহেবের অনেক বিরোধীও দেখি, একই ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত। আমার বা আমাদের সমালোচনা মানেই - আমাদের শত্রু, তৃণমূল বা অন্যের লোক। মার্কসবাদীরা এত সহজ সমীকরণে বিশ্বাসী হবেন না, এটাই প্রত্যাশিত। রাজ্যের উন্নয়ন, আসলে মানুষের উন্নয়ন নিয়ে কারও আপত্তি নেই, আপত্তি উন্নয়নের নামে আসলে অবনয়ন হচ্ছে না তো - রাজ্যটাকে বেচে দেওয়া হচ্ছে না। তো? নয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরা তো এখনও প্রায় রাজদণ্ড হাতে। তারা বাজেট তৈরিতে সাহায্য করছেন, কলকাতায় পুরসভার কাজের তদারকি করছে। তাদের পরামর্শে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রী বাঙালি প্রথা, সংস্কৃত ভুলে হ্যালো, থ্যাঙকইড, গুড মর্ণিং শিখছে। সর্বনাশের আর বাকি কোথায়?

শিশুরাই যদি মেরুদণ্ডহীন হল জাতি বাঁচবে কি করে?

বি. বি. বাবুদের এত আগ্রহ কেন?

শিশুমৃত্যুর হারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ভারতে তৃতীয় (সূত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ আগস্ট ২০০৪)। মেয়েদের মধ্যে অপুষ্টির হারের বিচারে এ রাজ্যের স্থান গৌরবজনক নয়। আর এই সময় বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে লাফানো ঝাঁপানো নাকি কর্মসংস্থান ও গরিবি ঘোচানোর লক্ষ্যে। আবেগ বা বক্তৃতার কচকচানি নয় বাস্তবের দিকে চোখ ফেরান। বিশ শতকের আশির দশকে উদারীকরণ শুরু হয়। ষাট ও সত্তর দশক ছিল জাতীয়করণের দশক। উদারীকরণের প্রথম ঢেউ পৌঁছায় চেকোশ্লোভাকিয়া। ফর্মুলা - বিদেশি বিনিয়োগ, বেসরকারিকরণ, স্বাস্থ্য, শিল্প গ্রামোন্নয়নের অর্থ ছাঁটাই। পরিকাঠামো বা রাস্তা ও নগরায়ণের জয়ঢাক পেটানো। এর জন্য কী দরকার? বিদেশি বিনিয়োগকারী (বি.বি) দের সস্তায় জমি, বিদ্যুৎ জল। এবং দেশিদের তুলনায় বিদেশিদের আয়কর মুক্ত করা অথবা কম আয়কর দেওয়া, এর সঙ্গে দেশের শ্রম আইন না মানার অধিকার তথা যথেচ্ছ ছাঁটাই, আট ঘন্টার বদলে বারো ঘন্টার কাজ, পি এফ বা নিয়োগপত্রের বালাই তেমন থাকবে না - ইত্যাদি। এনিয়ে চুক্তিও হয়। চুক্তিতে বলা হয়, নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর আয়কর লাগবে। লাগবে জল ও বিদ্যুৎ -এর জন্য বাজার মূল্য। যখনই আয়কর লাগে তখনই পরিকাঠামো নেই অজুহাত তুলে সে দেশ বা রাজ্য ছাড়ে বি. বি. রা। এভাবেই চেকোশ্লাভাকিয়ায় শোষণ শেষ। বি. বি. -দের নতুন গন্তব্য হল আর্জেন্টিনা। তার দশা এমন দাঁড়াল যে বি. বি. বন্ধু মন্ত্রীদের দেশ ছেড়ে পালাতে হল বিক্ষোভের ঠেলায়। আর আর্জেন্টিনার শোষণের যখন অপ্রচারিত তখন তারই মাঝে বি. বি. বাবুরা ঢক্কানিনাদ তুলেছেন এশিয়ান টাইগারের। দক্ষিণ কোরিয়ার নাম আজ আর কেউ করে না। সিঙ্গাপুরের সিঙা ফোঁকার লোক দু’একজন এরাজ্যে এখনও আছেন। থাইল্যান্ড তো আজ যৌন পর্যটন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত। বি. বি. বাবুরা ঢক্কানিনাদ তুলেছেন এশিয়ান টাইগারের। বি. বি. বাবুদের নতুন শোষণক্ষেত্র হল ভারত। ভারতের গন্তব্যঃ বাঙ্গালোর। সেকি জয়ধ্বনি

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গরাপ্পার। সেখানে লুঠ শেষে নতুন সুযোগের সন্ধানে হায়দ্রাবাদ। পোস্টার বয় চন্দ্রবাবু। আর দুজন মুরগি পাওয়া গিয়েছিল ডিগ্নিরাজা এবং অশোক গেহলট। তাদের জন্য শোক করতে লোক আজ প্রচারমাধ্যমেও নেই। নতুন গন্তব্যঃ কলকতা। নতুন প্রশংসার পাত্রও পাওয়া গেছে। এরাজ্যে সব সুবিধা ভোগ শেষ হলে তাঁরা কোথায় যাবেন? ভুবনের ঈশ্বর তাঁরা? নবীন পট্টা তো জুটেই গেছে।

তবে আমরা আরেকটি থাইল্যান্ড অথবা আর্জেন্টিনা হব? আসলে বি. বি. বাবুদের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা। যে দেশ বা রাজ্য ছাড় বেশি দেবে সেখানে যাও - মধুলোটো - তারপর সুবিধার সময়সীমা শেষ হলেই বদনাম দিয়ে কেটে পড়ো। চেকোশ্লাভাকিয়ায় ওরা তাই করেছে। করেছে আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে। বাঙ্গালোরও ওরা ছাড়ছে একই কারণে। আমরা যেন ওদের ফাঁদে পা না দিই। আর তথ্য প্রযুক্তি, ঢক্কানিনাদ করে কি হবে।

পৃথিবীতে তথ্য - প্রযুক্তির মোট বাজার ৫৫ হাজার কোটি টাকা,
এর মধ্যে ভারতের অবদান ২%
ভারতের মোট ২৮১০ টি তথ্য - প্রযুক্তি সংস্থা আছে। তাদের মোট ব্যবসার পরিমাণ ১৪,৮১২ কোটি টাকা
এদের এক হাজার কোটি টাকার উপর আয় করে পাঁচটি সংস্থা।

৫০০-১০০০	কোটি টাকার মধ্যে ব্যবসা করে	৫টি সংস্থা
২৫০-৫০০	কোটি টাকার মধ্যে ব্যবসা করে	১৫টি সংস্থা
১০০-২৫০	কোটি টাকার মধ্যে ব্যবসা করে	২৭টি সংস্থা
৫০-১০০	কোটি টাকার মধ্যে ব্যবসা করে	৫৫টি সংস্থা
১০-৫০	কোটি টাকার মধ্যে ব্যবসা করে	২২৫টি সংস্থা
১০	কোটি টাকার মধ্যে ব্যবসা করে	২৪৮৩টি সংস্থা
		মোট ঃ ২৮১০টি

(সূত্র ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন - ২০০৩)

আর চারপাশে মৌ স্বাক্ষর করতে এত ঢাক - ঢোল। অতীতে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিল্পোন্নয়ন নিগম ৫৭টি মৌ স্বাক্ষর করেছিল, কার্যকর হয়েছিল তিনটি। আসলে দেশ জুড়েই এই দশা।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ঃ অনুমোদন এবং কার্যকর

(বিনিয়োগ কোটি টাকায়)

সাল	অনুমোদিত অর্থ	প্রকৃত কার্যকর	শতকরা
১৯৯১	৫৩৪	৩৫১	৬৫.৭
১৯৯২	৩৮৮৮	৬৭৫	১৭.৪
১৯৯৯	২৮৩৬৭	১৬৮৬৮	৫৯.৫
২০০১	২৬৮৭৫	১৯২৬৫	৭১.৭

(ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রতিবেদন - ২০০২-০৩)

আর রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে এত শোরগোল, সারা দেশে যা বিনিয়োগ হচ্ছে তার বিচারে এ রাজ্যে এখন ৬ (ছয়) নম্বরে।

আর বিদেশি বিনিয়োগ বেশি ডেকে যারা আনে, তাদেরই সরকার থেকে চলে যেতে হয়। জনবিক্ষোভে। ইতিহাস তাই বলছে। মুঘল আমল থেকে আজ - একই কথা সত্য। কলকাতা ইংরেজদের হাতে দেওয়া হয়েছিল বর্ধমানে বসে চুক্তি করে।

পরে মুঘল বংশ ধ্বংস করে ইংরেজরা। তাই ধীরে। বিদেশি বিনিয়োগবাবুরা ধীরে।

বিকল্প ঃ

প্রশ্ন করা তো সহজ। সমালোচনাও। বিকল্প কী? এতদিন জানতাম, বামপন্থাই বিকল্প। এখন যুক্তি, বলা হচ্ছে এই ব্যবস্থায় বিকল্প অর্থনীতি সম্ভব নয়। তাহলে কি ক্ষমতায় থাকার জন্যই ক্ষমতায় থাকা? তা তো নয়। বিকল্প, চোখের সামনেই, শুধু মার্কিনি ও ডি এফ আই ডি-র পরামর্শদাতাদের দেওয়া চশমাটা খুলে ফেলতে হবে।

১। জোর দিতে হবে কৃষিভিত্তিক শিল্পে। প্রযুক্তি পাওয়া বা জানা মোটেই কঠিন নয়। উন্নত গবেষণার জন্য মনোযোগ দিতে হবে। রাজ্যে বহু শিল্পপতি আছে যারা, এক্ষেত্রে বিনোয়োগ সক্ষম। তাদের বোঝাতে হবে। বাড়াতে হবে গোবিন্দভোগ। তুহলিপাঞ্জি। জিরেকাটি চাল, আলু, আম, ফুলের রপ্তানি।
২। চর্মশিল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহ দিতে হবে। গোটা বিশ্বে ভারত এখন দু'নম্বরে। রাজ্য চার নম্বরে। এক নম্বরে উঠে আসা সহজেই সম্ভব। গরু, ছাগলের চামড়া অন্য রাজ্যের তুলনায় এখানে সহজলভ্য। দক্ষ কারিগরও প্রচুর। দরকার সরকারি সাহায্য ও শহজ শর্তে ঋণ এবং সমবায় গঠন।
৩। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। তার বাজার শেষ পর্যন্ত সংকুচিত ও সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বস্ত্রশিল্পে বিপুল সম্ভাবনা। বহুকাল থেকে আমরা এবিষয়ে উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অধিকারী। সূতি ও খদ্দরের চাহিদা বাড়ছে বিশ্বে। সে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।
৪। মাছ ও ডিমের বাজারে রাজ্যের আবদান মাত্র ২০ শতাংশ। একে ৬০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া মোটেও কঠিন নয়। এর জন্য পার্ঠিগত উদ্যোগ চাই।
৫। চা - কমলালেবু বিদেশি মুদ্রা আনা। সোনাও। তার প্রসার ঘটাতে হবে।